ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact factor: 4.5
Volume- I, Issue-VI, July, 2025, Page No. 1436-1446
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711

ছাঁচে বাঁধানো সন্দেশ: এক লৌকিক শিল্পের অন্বেষণ

কৌশিক হালদার, *সহকারী অধ্যাপক, চারুকলা এবং নকশা বিভাগ, সিস্টার নিবেদিতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 23.06.2025; Accepted: 10.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Scholar Publications. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Absrtact

This article explores the historical evolution of Sandesh, a form of sweet dish in Bengal. The name Sandesh originated from Hindi, means "message." This delicious and traditional sweet has been an integral part of Bengali culture since the Middle Ages. It holds a significant place in rituals, festivities, and as symbolize a token of goodwill. During the colonial period, the rising demand for novelty in sweets by the British officials and the Bengali babus led to the invention of various delicacies of sandesh.

It gains familiarity in the Bengali culture and the sweet-makers or modaks, began using moulds crafted from clay, stone, or wood to create unique designs for it. These are often handmade by the traditional craftsmen and later by women in their households, depicting intricate motifs that reflect cultural narratives, religious symbols, and aesthetic sensibilities of that time. In modern period, the traditional mould-making craft faced extreme decline in production due to mass-produced plastic, silicone, and aluminium moulds. It resulted in the declining of skilled mould makers and its demand. Hence, the craft is on the verge of extinction today. This study focuses on the origin and evolution of the sandesh mould making practice, social and cultural influences on their design and the shift from traditional to modernity. It also analyses the current challenges faced by traditional mould artisans in the face of technological advancement and changing consumer preferences in Bengal.

Keywords: Bengali sweets, Mould making, Craft, Extinction, consumerism

বাঙালি জাতি চিরকালই খাদ্যরসিক। তাই তো প্রবাদ প্রচলিত-বাঙালির ‘বারো মাসে তেরো পার্বণ’। অর্থাৎ সারা বছর নানা রকম আচার অনুষ্ঠান লেগেই থাকে। তাই উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই বাঙালির শিল্পচেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ব্যবহারিক প্রয়োজনে, কখনও বা ধর্মীয় ও সামাজিক উপলক্ষকে কেন্দ্র করে। যেহেতু বাঙালি খাদ্যরসিক এবং নানা আচার অনুষ্ঠানে মত্ত, সেহেতু খাদ্য তালিকার মধ্যে- খাবারের পাতের শেষে হোক, অতিথি আপ্যায়নের ক্ষেত্রেই হোক বা পুজো- অর্চনার ক্ষেত্রে মণ্ডা, পিঠে-পুলি, সন্দেশ, চন্দ্রপুলি, নারকেলে নাড়ু, মনোহরা প্রভৃতি মিষ্টি নিবেদন করে থাকে। তবে এই মিষ্টি শুধু স্বাদের জন্য নয়, ছাঁচের মাধ্যমে নান্দনিক রূপে গঠিত হয়ে বাংলার লোকশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে।

সন্দেশ একটি সুস্বাদু ও ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি। বাঙালি জীবনে সন্দেশ জড়িয়ে আছে খুব সম্ভব মধ্যযুগ থেকে। (১৮০০ শতকের পর) পর্তুগিজদের মাধ্যমে ছানা প্রথম বাঙলায় প্রবেশ করে এবং সেই ছানা ছাঁচে ফেলে মিষ্টি তৈরি হতে দেখা যায়। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য যেমন- কৃত্তিবাসী রামায়ণ-এ, ধর্মমঙ্গল-এ, চৈতন্যচরিতামৃত-এ মিষ্টির

উল্লেখ পাওয়া যায়, যা এই ঐতিহ্যের দীর্ঘস্থায়িত্ব ও গুরুত্ব প্রমাণ করে।[১] এছাড়া, উৎপল ঝা তাঁর প্রবন্ধে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন-

> “মহেন্দ্র নাথ দত্তের লেখা থেকে জানা যায়, পান-সুপারি দিয়ে বিয়ের নিমন্ত্রণের জায়গা নেয় শুকনো ছানার মিষ্টি বা সন্দেশ। এখানে বিয়ের মতো শুভ খবর বা সন্দেশের সঙ্গে খাবার সন্দেশ যাচ্ছে।”[২]

এই রীতি থেকে বোঝা যায়, সন্দেশ কেবল খাদ্য হিসাবে নয়, এক ধরনের বার্তা বা ‘সন্দেশ’ প্রেরণের বাহক হিসেবেও ব্যবহৃত হত। ফলে সন্দেশ শব্দটির হিন্দি উৎস ‘সন্দেশ’ অর্থাৎ ‘বার্তা’ এই ব্যবহারিক দিক থেকেও সাযুজ্যপূর্ণ।

বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি গুলির মধ্যে সন্দেশ, চন্দ্রপুলি বা নারকেলের নাড়ু প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের নকশা খোদাই করা (কাঠ, পাথর বা মাটির) ছাঁচে ফেলে মিষ্টি তৈরি করতে দেখা যায়। এসব ছাঁচ গুলির মধ্যে ধর্মীয় চিহ্ন, ফুল, লতা-পাতা, দেবদেবীর প্রতীক, কিংবা রাজনীতি বা সমাজিক রীতিনীতিও প্রতিফলিত হয়। এই শিল্পরীতির মাধ্যমে বাংলার লোকশিল্প ও বাঙালির শিল্পচেতনার বিকাশ প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষ করে সন্দেশ ও আমসত্ত্বের ছাঁচে এর উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে বর্তমানে আমসত্ত্বের ছাঁচ তেমন ভাবে আর দেখা যায় না।

আধুনিক কালে এই ছাঁচ শিল্প সংকটজনক অবস্থার মুখোমুখি হয়েছে। প্লাস্টিক, সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের আধুনিক ছাঁচ বাজার বা অনলাইনে অতি সহজে কম খরচে পাওয়ার ফলে, খোদাই করা ছাঁচের ব্যাবহার অনেকটাই কমে যাওয়ায়, এই প্রাচীন শিল্প প্রায় বিলুপ্তির পথে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দক্ষ শিল্পীদের অভাব, শ্রমের তুলনায় কম পারিশ্রমিক এবং সময়সাপেক্ষ হওয়ায়, ঐতিহ্যবাহী এই ছাঁচ শিল্পের অস্তিত্ব আজ সংকটে পড়েছে।

এই প্রবন্ধে বাংলার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি সন্দেশের ইতিহাস ও উৎপত্তি, ছাঁচশিল্পের নান্দনিক রূপ, সামাজিক প্রভাব, প্রাচীন ও আধুনিক ছাঁচের তুলনামূলক পরিবর্তন এবং প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণের প্রেক্ষিতে শিল্পীদের বর্তমান অবস্থা নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

সন্দেশের ইতিহাস:

১৮০০ শতকের প্রথম দিকে বাংলায় ছানার তৈরি সন্দেশের কোন প্রচলন ছিল না। কারণ দুধ ফাটিয়ে ছানা তৈরি করা অশুভ হিসেবে মনে করা হত। এই সময় ক্ষীরের বিভিন্ন রকমের মিষ্টি প্রচলিত ছিল। ১৭৫৭ পলাশির যুদ্ধের পর, ১৮০০ শতকের মাঝামাঝি ফরাসিরা চন্দননগরে এবং পর্তুগিজরা ব্যান্ডেলে কুঠি স্থাপন করে। উৎপল ঝা এর প্রবন্ধে লেখা ‘এপার বাংলার মিষ্টান্নশিল্প, মিষ্টান্নসংস্কৃতি: প্রাক্ কথা’- তে বর্ণনা করেছেন- বাঙালি (ময়রা) ছানা তৈরির কৌশল শিখেছিল এই পর্তুগিজদের কাছে কটেজ চিজ তৈরী দেখে। তবে এই কথা পুরোপুরি ভাবে মেনে নেওয়া যায় না। কারণ বাংলার জলহাওয়ায় স্বাভাবিক অবস্থাতে অনেক সমায় দুধ ফেটে ছানা হয়ে যেত। (এই ছানা) তা ব্যবহার না করে ফেলে দেওয়া হত, এই কথা বিশ্বাস করা যায় না। তবে বাঙালি (ময়রারা) কৃত্রিম উপায়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ছানা তৈরির পদ্ধতি বা জোগান পর্তুগিজদের কাছ থেকে শিখেছিল। পর্তুগিজরা কটেজ চিজ তৈরির জন্য যে প্রাণীজ রেনেট ব্যবহার করত, তা বাঙালি ময়রারা দুধ ফাটিয়ে ছানা তৈরির ক্ষেত্রে (প্রাণীজ রেনেট) ব্যবহার না করে (লেবুজাতীয়) প্রাকৃতিক অম্লকে ব্যবহার করত।[৩] ফলে ছানা আসার পর, মিষ্টির ইতিহাসে ছানার মিষ্টি এক অন্য রুপ নিল। তাদের মধ্যে অন্যতম হলো বিভিন্ন আকারের তৈরি ছাঁচের সন্দেশ। এই শিল্পকে কেন্দ্র করে উত্তর কলকাতার বিভিন্ন স্থানে চিৎপুর, সুতানুটি, প্রভৃতি জায়গায় খোদাই কারিগরদের দোকান গড়ে উঠে।

এই সন্দেশ বাংলায় তৈরি হলেও মধ্যবিত্ত পরিবার বা নিম্নবিত্ত পরিবারের খাবার তো দূরের কথা- পূজা-অর্চনায় ভোগ দেবার ক্ষমতাও ছিল না। কারণ সেই সময় আর্থিক সমাজ-ব্যাবস্থা খুবই খারাপ ছিল। সন্দেশ, বাবু সমাজ বা ব্রিটিশ সাহেবদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল।

মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গলে বলেন-

> “সংখ্যাধিক্য গরিব গ্রামীণ মানুষেদের সারা বছর ধরে মিষ্টি কিনে খাওয়ার সামর্থ্য ছিল না। তারা সাধ্যমতো ঘরোয়াভাবে বাড়িতেই পিঠে-পুলি, নাড়ু ইত্যাদি তৈরি করে মিষ্টির চাহিদা পূরণ

করত। অবস্থাপন্ন পরিবারের উৎসব অনুষ্ঠানে বাড়িতে ভিয়েন বসত এবং ময়রারা সেই মিষ্টি বানাতেন।"[৪]

তবে এই ইতিহাস জানতে গেলে একটু পেছনে ফিরতে হবে অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের পর, বাংলার সামাজ-ব্যবস্থার অর্থনৈতিক পরিকাঠামো ভেঙ্গে পড়ে। সেই সঙ্গে বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের একাধিপত্য গড়ে উঠেছিল। সাধারন মানুষের ঠিক মত খাবার জুটত না। তবে সেই সময় কিছু জমিদার ধীরে ধীরে ব্রিটিশদের সঙ্গে থাকতে থাকতে ব্যাবসার মাধ্যমে পয়সা করে তোলে। তাদের মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ, বাবু নামে পরিচিত হয়। এই বাবুদের মধ্যে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে এক দেখনদারির প্রচলন হয়, সেইসঙ্গে তাদের অনেক সৌখিনতাও ছিল। যার ফলে যে কোন আচার অনুষ্ঠানে খাদ্য তালিকায় খাবারের শেষে বিভিন্ন রকমের মিষ্টি থাকত। তাঁরা এই মিষ্টি গুলির মধ্যে নিত্য নতুন ছোঁয়া রাখতে চাইত, ফলে দেখা গেল বিভিন্ন আকৃতির ছাঁচের তৈরি সন্দেশ। শুধু বাবু সামাজে নয়, ব্রিটিশদেরও ছাঁচের মিষ্টির প্রতি কম চাহিদা ছিল না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, সেই সময়- রানি রাসমণির

"দক্ষিণেশ্বর মন্দির উদ্ধোধনের দিন অতিথি সেবার জন্য পাঁচশ মণ সন্দেশ আনা হয়েছিল বলে, ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে ৮ জুনের, সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার সংবাদ সুত্রে জানা যায়......।"[৫]

ছাঁচের ইতিহাস:

পর্তুগিজদের কাছ থেকে ছানা তৈরির প্রক্রিয়া শেখার পর, বাংলায় মিষ্টির জগৎ এক নতুন রূপ নিল এবং বিভিন্ন আকৃতির ছানার মিষ্টি তৈরি হতে লাগলো। তার মধ্যে অন্যতম ছিল, ছাঁচের তৈরি সন্দেশ। যার ফলে বিভিন্ন ধরনের ছাঁচের তৈরি নকশা করা মিষ্টি বা সন্দেশ দেখা গিয়েছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ছাঁচের মিষ্টির প্রতি চাহিদা বাড়ার ফলে, সৃষ্টি হয়েছিল মিষ্টি শিল্পের, তার সঙ্গে ছাঁচ কারুশিল্প। অসিত পাল এর 'বট তলার ডায়েরি' বই এর একটি লেখা থেকে জানা যায়,- সেই সময় শ্রীরামপুর বা কালীঘাটের ব্লক প্রিন্টের কারিগররা মেটাল ব্লক বা লিথো প্রেস (যখন 'মেটাল ব্লক বা লিথো প্রেস বাজারে এসে গেলো অর্থাৎ ১৯০৩ থেকে')[৬] আসার পর, কাজের পরিমাণ কমে আসে। সেই সঙ্গে আর্থিক অবস্থার মন্দা দেখা দেওয়ার ফলে, এই কারিগররা ধীরে ধীরে ছাঁচ শিল্পের খোদাই কারুকার্যে যোগ দিয়েছিল।[৭] যার ফলে বিভিন্ন নকশার তারতম্য ঘটে। "এই খোদাই কাজ মূলত হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষদের করতে দেখা গিয়েছিল।"[৮] উত্তর কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় যেমন- চিৎপুর, নতুন বাজার, কালিঘাটে ছোট ছোট দোকান দেখা দিল এবং ছোট ছোট খোদাই শিল্প কারখানা গড়ে উঠল। সময়ের সঙ্গে চলতে চলতে পরবর্তীকালে গৃহস্থের মধ্যে ঢুকে পড়ল সন্দেশের ছাঁচ বা আমসত্বের ছাঁচ শিল্প। এই কারিগরি শিল্পীদের নিখুঁত খোদাই এর দক্ষতা বোঝাতে গিয়ে- অসিত পাল 'বট তলার ডায়েরি' বইটিতে লিখেছেন- এমন একজন গরানহাটার এক শিল্পী যে এক সময় জাল কারেন্সি নোট (কাঠের উপর সূক্ষ্ম রেখার মাধ্যমে খোদাই করা নোট) ছাপায় এবং তা ছড়িয়ে পরে। অল্প দিনের মধ্যে সে ধরাও পরে। ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট তার আঙ্গুল কেটে নেবার সাজা দিয়েছিল, কিন্ত তার কাজের দক্ষতা দেখে তার সাজা মকুব করে দায়। যদিও তার জেল হয়েছিল।[৯] এই ছাঁচ খোদাই শিল্পীরা এসেছিল ব্লক প্রিন্ট থেকে। অসিত পালের লেখা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া য়ায় এবং সেই সঙ্গে এই খোদাই শিল্পীদের খোদাই দক্ষতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। এমন কি কলকাতার ব্রিটিশ সাহেবরাও মুগ্ধ হয়েছিল সন্দেশের নকশা গুলি দেখে।

এই সময় (১৮০০ শতকের মাঝের দিক থেকে) থেকেই ছাঁচের ব্যবহার শুরু হয়েছিল মিষ্টির দোকানগুলিতে। যেমন- ভীম নাগের মিষ্টি ১৮২৬, গিরিশ চন্দ্র দে এবং নকুর নন্দী ১৮৪৪, মাখনলাল দাস অ্যান্ড সন্স, বলরাম মল্লিক এবং রাধারমণ মল্লিক, নলিনচন্দ্র দাস, সেন মহাশয় এবং কে.সি. দাস। এই ছাঁচের খোদাই এর মধ্যে দিয়ে কারিগররা তুলে ধরেছিল সামাজিক ঘটনার রীতিনীতি, বিভিন্ন ব্যঙ্গ চরিত্র।

ছাঁচের আকৃতি:

এই (সন্দেশের) ছাঁচ গুলির আকার ছিল দুই ধরনের- ১. ফিগারেটিভে (রূপক), ২. জ্যামিতিক (বর্গাকার, বরফি, ত্রিকোণ, বৃত্ত বা অর্ধচন্দ্রাকার)। আবার কোনটি ছিল বাটির মত, কোনটি আবার সমতল। এই ছাঁচ গুলির মধ্যে নকশা হিসাবে ফুল, লাতাপাতা, মাছ, লিচু, আতা, কমলা, ময়ূর পাখি, পদ্ম, প্রজাপতি, ইত্যাদি খোদাই করা হত। এছাড়া

আলপনার সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে অনেক নকশা তৈরি করা হত। নকশা গুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ, বেশিরভাগ মিষ্টির নামকরণ করা হয় নকশার আকার অনুসারে। উদাহরণস্বরূপ, জল-ভরা তাল শাঁস বা লিচু, আতা (ছবি: ১, ২ এবং ৩) ইত্যাদি সন্দেশের নামকরণ করা হয়েছে ফল বোঝাতে।

ছবি: ১, ২ এবং ৩ বিভিন্ন আকৃতির কাঠের ছাঁচ, (চিত্র সংগ্রহ: লেখক)

তিন ধরণের ছাঁচ মূলত তৈরি এবং বিক্রি করা হত।

প্রথম- দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য ছাঁচ, যা দোকানদাররা কিনতেন। এই ছাঁচ গুলি বিভিন্ন আকারের হত। দাম নির্ভর করত ছাঁচের নকশা এবং আকারের উপর ।

দ্বিতীয়- বর-কনে, হরিণ, প্রজাপতি, ময়ূর, মাছের মতো আকৃতির ছাঁচ। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে নকশা করা ছাঁচের মিষ্টির বিশেষ আকর্ষণ ছিল। এই ছাঁচগুলি আকারে তুলনামূলক ভাবে বড়।

তৃতীয়- এই ধরণের ছাঁচে বিভিন্ন ধরনের লিপি বা শব্দ নকশা করা ছাঁচের মিষ্টিতে ব্যবহার করতে দেখা যেত। যেমন- শুভবিবাহ, গাত্রহরিদ্র, অন্নপ্রাশন, ভাইফোঁটা, শুভ বিজয়া, শুভ নববর্ষ ইত্যাদি। যাকে অনুরোধের ভিত্তিতে তৈরি ছাঁচ বলা যেতে পারে।

ছাঁচ নির্মাণের প্রক্রিয়া:

এই মিষ্টির ছাঁচ হল দৈনন্দিন ব্যবহারিক এক শিল্প। এই শিল্পের মধ্যে সমসাময়িক সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্মীয় রীতিনীতির, দৈনন্দিন জীবনের প্রভাব লক্ষ করা যায়। এই কাজ সৃষ্টির আনন্দে বা জীবন জীবিকা নির্বাহের জন্য করতে দেখা যায়। যেমন- তারাপদ সাঁতরা এর লেখা 'পশ্চিমবঙ্গ লোকশিল্প ও শিল্পসমাজ', বরুণ কুমার চক্রবর্তীর লোকজ শিল্প, অসিত পালের লেখা বটতলার ডায়েরি, সেই সঙ্গে জয়ন্ত কুমার দাস এর খোদাই শিল্পীর সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, ছাঁচ তিন ধরনের তৈরি হতে দেখা যায়- ১. মাটির ছাঁচ ২. পাথরের ছাঁচ এবং ৩. কাঠের ছাঁচ। বর্তমানে মিষ্টি তৈরির ক্ষেত্রে কাঠের ছাঁচ দেখা গেলেও একটু পেছনে গেলে মাটি বা পাথরের ছাঁচের সন্ধান মেলে। এই ছাঁচ গুলি খোদাই করার বা মডেলিং করার জন্য বিভিন্ন ধরনের বাঁশের টুলস, কাঠ খোদাইয়ের জন্য বাটালি ও ম্যালেট এবং পাথর খোদাই করার জন্য চিজ্ল বা ধারালো নরুন ব্যবহার করা হয। ছাঁচের রিলিফ খোদাই করা নকশা বা অক্ষর গুলি বিপরীত দিকে থাকে। উল্টো দিকে এই খোদাই কাজটি করতে একটু সময় লাগে। যেমন, 'অবাক' (ছবি: ৪) লেখা (১৫০ বছরের পুরোন) কাঠে খোদাই করা একটি সন্দেশের ছাঁচ। অসীম বাবু সাক্ষাতে বলেন একটি ছাঁচ তৈরি করতে যথেষ্ট সময় লাগে। একজন ব্যক্তি সারাদিনে চার থেকে পাঁচটি সর্বোচ্চ ছাঁচ তৈরি করতে পারে। নকশার উপর নির্ভর করে একটি ছোট কাঠের ছাঁচের দাম আনুমানিক ১০০ টাকা হয়।

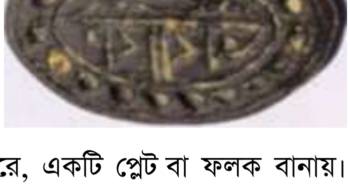

ছবি: ৪ কাঠের তৈরি 'অবাক' লেখা সন্দেশের ছাঁচ, (চিত্র সংগ্রহ: লেখক)

মাটির ছাঁচ যথেষ্ট আকর্ষণীয় এবং দূর থেকে দেখতে অনেকটা গ্রানাইট এর মত। কুমোররা নরম মাটি তৈরি করে, একটি প্লেট বা ফলক বানায়। এই নরম মাটির উপর বাঁশের টুলস দিয়ে

বিভিন্ন ধরনের নকশা করে। এই নকশার ওপর একটি বিশেষ ধরনের রং, যার উপরে খাল বা পুকুর থেকে আনা কালো মাটি বা বনক এর প্রলেপ দেওয়া হয়। বনক হচ্ছে এক ধরনের কালো বা হলুদ রং যা কুমোররা প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করে থাকে।[১০] এই বনক ছাঁচের নকশার গায়ে লাগিয়ে দেওয়া হয় এবং শুকানোর পর চুল্লির মধ্যে ছাঁচ গুলি রেখে ঘুটে দিয়ে ৬ থেকে ৮ ঘন্টা আগুন লাগিয়ে ৮০০°C . তাপমাত্রায় পোড়ান হয়। ধোঁয়া যাতে বেরিয়ে না আসে তার উপর লক্ষ রাখা হয়। আগুন নিভে যাবার পর কুমোররা ১০ থেকে ১২ ঘন্টা রেখে দেয়, যাতে ছাঁচের রং আরও গাঢ় হয়। পোড়ানোর কৌশলের উপর মাটির ছাঁচের রং নির্ভর করে। আমরা বিভিন্ন সংগ্রহশালায় যে ছাঁচ দেখে থাকি, তা অধিকাংশ কালো ও পোড়ামাটির। পরবর্তীকালে বাড়ীর মহিলাদের অর্থাৎ মা ঠাকুমাদের মাটি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ছাঁচ ও নকশা করতে দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে পোড়ানোর জন্য কুমোর সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করতে হত। এই ছাঁচ গুলি বেশিরভাগ ছানা বা নারকেলের মিষ্টি তৈরি করতে ব্যবহার করা হত। তুলনামূলক ভাবে মাটির ছাঁচ দামেও কম থাকায়, বিভিন্ন মেলা বা কালীঘাটের দোকান গুলি তে বিক্রি করতে দেখা যেত। বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে, মাটির ছাঁচ গুলি ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে, কাঠের ছাঁচ গুলি ব্যবহার করতে বেশি পছন্দ করতেন মিষ্টির দোকানদারেরা।

বর্তমানে মাটির ছাঁচ আর সেই ভাবে ব্যবহার হয় না। কিন্তু কাঠের ছাঁচের ব্যবহার এখনও লক্ষ করা যায়। কাঠ খোদাই করা ছাঁচশিল্পীদের কারিগরি কৌশল অনেক মৌলিক। ছাঁচ গুলি তৈরি করতে সব ধরনের কাঠ ব্যবহার করা হত না। এ ক্ষেত্রে সেগুন (বার্মা, সিপি, রায়পুর ইত্যাদি), মেহগনি, হোল্ডি বা চাকুন্ডা কাঠ (আসামে পাওয়া যায়) ছাঁচের জন্য উপযোগী। ছাঁচ গুলির কাজ খুব সুক্ষ্ম বলে বার্মা সেগুন কাঠ বিশেষ কার্যকর। কারণ ফাইবার গুলো মসৃণ, স্তর বিশিষ্ট ও নরম যা খোদাই কাজের ক্ষেত্রে উপয়োগী। তবে এর দামের পরিমাণ বেশি থাকার ফলে, বিকল্প হিসেবে মেহগনি কাঠ ব্যবহার করা হয়। যা সহজে পাওয়া যেত। এই কাঠ গুলিকে ছোট ছোট টুকরো করে কাঠের উপর রেদা দিয়ে ঘষে সমতল ও মসৃণ করে, তার উপর পেন্সিল দিয়ে আঁকা হয়। এর পর বিভিন্ন রকমের বাটালির (এক ইঞ্চি, হাফ ইঞ্চি বাটালি, রাউন্ড, ফ্লেট বাটালি) মাধ্যমে কাঠের উপর হাতুড়ি দিয়ে ঘা মেরে একটি আকৃতি তৈরি করে, তার উপর খুব সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম বিভিন্ন ধরনের নকশা করা হয়। এই ছাঁচ গুলোর মধ্যে লতা-পাতা ফুল-ফল পশু-পাখি, দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ইত্যাদি নকশা পরিলক্ষিত হয়। তবে নকশা গুলো সব উল্টো ভাবে করা হয। কাঠের ছাঁচ গুলি খুব সাবধানে খোদাই করা হয়। কারণ সামান্য একটু ভুল হলে অর্থাৎ সেই ছাঁচ খোদাই করতে গিয়ে একটু বেশি গর্ত হয়ে গেলে, বাতিল হয়ে যায়। কারণ তার মধ্যে ছানার পরিমাণ বেশি লাগলে খরচের পরিমাণ বেড়ে যায় বা ছাঁচ থেকে সন্দেশ যদি বের না হয় অর্থাৎ ছাঁচের গায়ে সন্দেশ বের করতে গিয়ে আটকিয়ে গেলে, তা নষ্ট হয়। তাই খুব সাবধানে কাজটি করতে হয়। ছাঁচ গুলি ২ ইঞ্চি থেকে ৪ ইঞ্চির মধ্যে তৈরি হয়। আবার ১০ থেকে ১২ ইঞ্চি সন্দেশের ছাঁচ গুলি বিশেষ করে অনুষ্ঠান এ ব্যবহার হয়। এই ছাঁচ গুলো তুলনামূলক ভাবে অনেক বড়। সন্দেশ বা নারকেলের ছাঁচ গুলির নকশা একটু আলাদা। নারকেলের টেক্সচার রুক্ষ বলে বেশি গভীর ও কম নকশা করা ছাঁচ ব্যবহার হয়। অপর দিকে সন্দেশের দানা সুক্ষ্ম ও নরম বলে, সুক্ষ্ম নকশা করা ছাঁচে কাস্ট করা হয়। সন্দেশ বা নারকেলের মিষ্টি ছাঁচে বার বার ব্যবহার করার ফলে, এর মধ্যে থাকা তেল ছাঁচ শোষণ করে নেয়, ফলে এর স্থায়ীত্ব অনেক বেড়ে যায়। জয়ন্ত দাস বলেন যে এটা তাদের জন্য ভালো খবর নয়। কারণ ছাঁচ-এর অধিকাংশ ক্রেতা হচ্ছে মিষ্টির দোকানের মালিক। তবে মিষ্টির দোকানে ইঁদুর বা তেলা পোকা ছাঁচ গুলি খেয়ে নষ্ট করার ফলে বা প্রতি দুই মাস অন্তর মিষ্টি তৈরির উপকরণের দামের পরিবর্তন এর ফলে, দোকানদারদের মিষ্টির আকারের বা গঠনের পরিবর্তন করতে হয়। ফলে দাম পরিবর্তন কখনও করতে হয় বা কখনও হয় না। তার জন্য আবার নতুন আকারের ছাঁচশিল্পী কারিগরদের কাছ থেকে ছাঁচ কিনতে হয়। এই ভাবে ছাঁচের চাহিদা বার বার নানা ভাবে তৈরি হতে থাকে।

এই সময় মাটির বা কাঠের ছাঁচের সঙ্গে সঙ্গে নরম পাথরের ছাঁচ ও দেখা গিয়েছিল। যা হল আমসত্ত্বের ছাঁচ (ছবি: ৫) । এই ছাঁচ তেমন আর এখন দেখা যায় না। গুরুসদয় মিউজিয়ামে বেশ কিছু পাথরের ছাঁচ রাখা আছে। "গুরুসদয় মিউজিয়ামে সংরক্ষিত মোট ছাঁচের সংখ্যা ৭২টি তার মধ্যে আমসত্ত্বের ছাঁচের সংখ্যা ২০টি।"[১১] তবে দুঃখের বিষয় এই সংগ্রহশালাটি বন্ধ হয়ে গেছে। যারা পাথরের পুজা-পার্বণ এর বাসনপত্র

ছবি: ৫. পাথরের তৈরি আমসত্ত্ব ছ ামাজিক দর্পণের গল্প (Diece of Sweets and the reflection of so শ-কথা (Kolkatar Nokshi Kotha) (wordpress.com)

খোদাই করত, তাদেরই পাথরের ছাঁচ গুলি তৈরি করতে দেখা যেত। এই ছাঁচ গুলি ছিল বেশির ভাগ গোলাকার। নকশা গুলি খুব নিখুঁত ভাবে চিজেল দিয়ে খোদাই করা হত। তার মধ্যে পদ্ম, ফুল, বিভিন্ন লতাপাতা নকশা ভরাট করে খোদাই করা হত। বরুণ কুমার চক্রবর্তীর 'লোকজ শিল্প' প্রবন্ধে পাওয়া যায়- গৃহস্থ পরিবারে মা ঠাকুমারা দুপুর বেলা, বসে গৃহস্থের রান্নাঘরের এবং পুজো -অর্চনার ব্যবহৃত পরিত্যক্ত ভাঙা থালার উপর নরুন এর সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের নকশা খোদাই করে আমসত্ত্ব ছাঁচ বানাত।[১২]

আধুনিক সময়ে ছাঁচের পরিবর্তন:

সময়ের সঙ্গে চলতে চলতে মিষ্টির সঙ্গে ছাঁচেরও পরিবর্তন ঘটেছে। এই আধুনিক সময়ে মাটির ছাঁচ, পাথরের ছাঁচ বা কাঠের ছাঁচ এর বদলে বাজারে ধাতু, প্লাস্টিক, সিলিকন, ইত্যাদির ছাঁচ অতি সহজে পাওয়া যাচ্ছে। দামের পরিমাণ কম থাকায় সাধারণ মানুষেরা এই দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তবে এই ছাঁচ মিষ্টি তৈরিতে বারবার ব্যাবহার করার ফলে মিষ্টির উপকরণ থেকে যে তেল বা রস বের হয় তা এই ছাঁচের মধ্যে মিশে বিক্রিয়া করে যে কোনো মুহূর্তে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে। এছাড়া মিষ্টির দোকানদারেরা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধমে বিভিন্ন ধরনের মিষ্টির আকার ও নকশা খুব সহজে ও কম সময়ে তৈরি করে নিতে পারছে। যার ফলে প্রাচীন খোদাই ছাঁচ শিল্পকর্ম হারিয়ে যেতে চলেছে।

প্রাচীন ও আধুনিক নকশার তারতম্য:

তারাপদ সাঁতরা, 'পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পসমাজ', এ লেখা- "একালে মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপনের চটকদারি মিষ্টান্ন নয়, সেকালে বঙ্গবালাদের কৃত সেই মিষ্টান্ন, যা ছিল স্বাদেন্দ্রীয় তথা দর্শনেন্দ্রিয় এক তৃপ্তিকর সম্ভার।"[১৩] অর্থাৎ এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, মিষ্টিতে শুধু স্বাদেন্দ্রীয় নয় দর্শনেন্দ্রিয় এর যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। যার ফলে মিষ্টির এর নকশার উপরে যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এই নকশা গুলি ভাল করে লক্ষ করলে দেখা যায়, সেকালের সামাজিক রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান, বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব যথেষ্ট রয়েছে। তারাপদ সাঁতরা (পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পসমাজ) লেখাতে পাওয়া যায়- "গৃহশিল্পসামগ্রী পর্যায়ে আমরা আলপনা, কাঁথা এবং অন্যান্য শিল্পকর্মে যে সব নকশা সচরাচর দেখে থাকি, তার সব ধরনই কিন্তু এইসব ছাঁচে দেখা যায়। বস্তুর মাধ্যম হয়ত পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু তার রূপবৈচিত্র এর তফাৎ ঘটেনি।"[১৪] এর থেকে প্রমান পাওয়া যায় ছাঁচের নকশা গুলি আলপনা বা কাঁথা থেকে এসেছে। ভালো করে দেখলে- বিষয় অনুযায়ী ছাঁচ গুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হচ্ছে নকশা ভিত্তিক, আরেকটি হচ্ছে নকশা ও লিপি ভিত্তিক।

নকশা ভিত্তিক:

এই নকশা ভিত্তিক ছাঁচের মধ্যে দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য কিছু ছোট ছোট নকশা করা ছাঁচ তৈরি করা হয়। যার মধ্যে ফুল, লতা-পাতা, আতা, আলপনা, পশু-পাখি ইত্যাদি নকশা খোদিত হয়, যা অল্প সময়ের মধ্যে তৈরি হয়, দামেও কম থাকে। ফলে তার চাহিদা থাকে। এছাড়া বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে যে নকশা গুলি দেখা যায়। সেই গুলি হল-

১) বিবাহ অনুষ্ঠান: উপহার হিসেবে ময়ূরের অলংকৃত নকশা তৈরি করতে দেখা যায়। ময়ূরের পেখম বা পালক বোঝাতে সমতল কাঠের উপর গর্ত খোদাই করে অসংখ্য ছোট ছোট দাগ ব্যবহার করে, সুন্দর এক নকশা তৈরী করা

হয়। এছাড়া গাত্রহরিদ্রা বা ফুলশয্যা, মিলনক্ষেত্রে বা গৃহপ্রবেশ ক্ষেত্রে মাছের নকশা করা ছাঁচ তৈরি করতে দেখা যায। কারণ বাঙ্গালী মাছকে শুভ বা মঙ্গল হিসেবে ধরে। যেমন- মাখন লাল দাস অ্যান্ড সন্স মিষ্টি বিখ্যাত দোকানে ১৫০ বছরের পুরনো কাঠের তৈরি মাছের ছাঁচ। যা এখন মিষ্টি তৈরি করতে ব্যাবহার করা হচ্ছে (ছবি: ৬)।

২) পুজো-আচরণ: এক্ষেত্রে শঙ্খ বা পদ্ম ফুল এর আকারের নকশা করা মিষ্টি তৈরি করতে দেখা যায়। শঙ্খের মধ্যে বিভিন্ন আলপনা আকারের নকশা ব্যাবহার করা হয়। (ছবি: ৭) আবার পদ্ম ফুল সৃষ্টির আদি কাল থেকে যা শুভকামনা ও সমৃদ্ধির প্রতীক। তাই পদ্মফুলের নকশা বিভিন্ন ভাবে জ্যামিতিক বা আলপনার আকারে বিভিন্ন পুজো অর্চনায় ব্যবহার করা হয়। বিশেষ করে আমসত্ত্বের ছাঁচ পদ্মফুলের নকশার বিভিন্ন প্যাটার্ন লক্ষ করা যায়।

ছবি: ৬ ও ৭. কাঠের তৈরি মাছ ও শঙ্খ সন্দেশের (চিত্র সংগ্রহ: লেখক)

নকশা ও লিপিভিত্তিক:

নকশার সাথে বাংলা লিপিতে লেখা ছাঁচের বেশ কয়েকটি বার্তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, বিবাহের ক্ষেত্রে গাত্রহরিদ্রা (ছবি: ৮), ফুলশয্যা বা মিলন রাত, শুভ বিবাহ লেখা, বিজয়া দশমীতে শুভ বিজয়া, বাংলা নতুন বছরে শুভ নববর্ষ ইত্যাদি লিপি খোদাই করে নকশা করা হয়। তার মধ্যে বিভিন্ন ফুল, লতাপাতা, পশু-পাখি আল্পনা ইত্যাদি দিয়ে নকশা করে ভরাট করা হয়। ফলে সৌন্দর্যের এক অন্য মাত্রা তৈরী হয়। এটি অনুরোধ ভিত্তিতে তৈরি করা হয। তারাপদ

ছবি: ৮. কাঠের তৈরি বিবাহের ক্ষেত্রে গাত্রহরিদ্রা সন্দেশের ছাঁচ, (চিত্র সংগ্রহ: লেখক)

বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও শিল্পসমাজ লেখাতে উল্লেখ্য যে- "স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় গ্রাম বাংলার মেয়েরা ছাঁচের মধ্যে 'বান্দেমাতরম' কথাটিও ব্যবহার করতে ভুলে যাননি।"[১৫] এছাড়া সেই সময় দেখা গিয়েছিল ব্রিটিশদের "খুশি করার জন্য পাইপ টানা সাহেব আর মেম বসে থাকা ছাঁচের সন্দেশ যা একসময় খুব জনপ্রিয় ছিল।"[১৬] "কালীঘাটের পট চিত্রের আদলে সন্দেশে ছাঁচ ও দেখা গিয়েছে।"[১৭]

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় সন্দেশের নকশার পরিবর্তন ঘটেছে। অসীম দাস মহাশয় সাক্ষাৎকারে বলেন এখন সন্দেশের উপর লেখা 'শুভ জন্মদিন' শব্দটি খুব জনপ্রিয়। এছাড়া অন্যান্য অনুষ্ঠানের জন্য 'শুভেচ্ছা' শব্দটি বেশ জনপ্রিয়। বর্তমান প্রতিষ্ঠান গুলির যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য সন্দেশের উপর কোম্পানির নাম লেখানোর প্রভাব দেখা যাচ্ছে। জয়ন্ত দাস মহাশয় এক সাক্ষাৎকারে বলেন প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়ায় আধুনিক সমাজের ছোট বাচ্চাদের উপর লক্ষ রেখে ছোটা ভীম, পোকেমন বা ডোরেমন মত কার্টুন ছাঁচের মধ্যে বিভিন্ন নকশা করে বানানো হয়। যাতে বাচ্চারা মিষ্টির দোকানে গেলে এর প্রতি আকৃষ্ট হয়। আধুনিক সমাজে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জয়ের পর, সন্দেশের ছাঁচের উপর খোদাই করে লেখা 'বিজয়া' মিষ্টি পরিবেশন করে থাকে। এছাড়া অনেক সময় মানুষের মুখাবয়ব ছাঁচ হিসেবে দেখা যাচ্ছে। জয়ন্ত দাস সাক্ষাৎকারে বলেন- "বর্তমানে বিষয়গুলি, যথা- কেন্দ্রীয়

সরকারের বা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ‘স্বচ্ছ ভারত’ বা ‘নির্মল বাংলা’ নকশার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ছাঁচ তৈরি করেছি।”

বর্তমানে নকশা করা খোদাই ছাঁচের অবস্থা:

দুঃখের বিষয় যে বর্তমানে খোদাই করা সন্দেশের ছাঁচ কারুশিল্পটি হারিয়ে যেতে বসেছে। যান্ত্রিক উপায়ে তৈরি বিভিন্ন ধরনের যথা, প্লাস্টিক (ছবি: ৯), অ্যালুমিনিয়াম (ছবি: ১০) সিলিকন ইত্যাদির ছাঁচ গুলি বাজারে দেখা যাচ্ছে এবং দ্রুত উৎপাদন ও দাম কম থাকায় এর প্রতি চাহিদা যথেষ্ট বেড়েছে। যার ফলে এই ঐতিহ্যবাহী খোদাই করা কারু শিল্প হারিয়ে যেতে চলেছে। এর কারণ হিসেবে জয়ন্ত দাস এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন- পুরনো দক্ষ লোকের অভাব একটি বড় কারণ। এই ছাঁচ শিল্পের খোদাই কাজের জন্য ধৈর্য্য ও অনেক সময় লাগে এবং শারীরিক পরিশ্রম থাকায় নতুন প্রজন্মের কাউকে এই খোদাই কাজে যোগ দিতে দেখা যাচ্ছে না। এছাড়া ইন্টারনেট এর যুগে বিভিন্ন ধরনের মেশিন (প্লাস্টিক ছাঁচ, সিলিকন ছাঁচ, ইত্যাদি) আসার ফলে এই ছাঁচের চাহিদাও কমেছে। আবার তিনি এটাও বলছেন যে, মিষ্টির দোকান প্রচুর থাকার ফলে ছাঁচের চাহিদা তৈরি হচ্ছে। সেই পরিমাণে উৎপাদন আমাদের খোদাই শিল্পীরা পূরণ করতে পারছে না। যার ফলে এই শিল্প ভবিষ্যতে হারিয়ে যেতে চলেছে। যেমন, আমসত্ত্ব ছাঁচ আর দেখা যায় না। চিৎপুরের নতুন বাজারে রাস্তার দুই ধারে ৫ থেকে ৬ টি খোদাই শিল্পীদের দোকান পড়ে রয়েছে। জয়ন্ত কুমার দাস বলছেন সন্দেশের ছাঁচ এর চাহিদা যথেষ্ট রয়েছে। বিদেশেও অনেক রপ্তানি করা হয়।

ছবি: ৯ ও ১০. অ্যালুমিনিয়াম ও প্লাস্টিক-এ তৈরি আধুনিক সান্দেশের ছাঁচ, Tosaa Big Modak Prasad Maker Mould for Ganpati Pack of 4 : Amazon.in: Home & Kitchen

কারিগরি শিল্পীদের সাক্ষাৎকার:

অসীম দাস: বয়স ষাট বছর। প্রায় ৪০ বছর ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। তাদের নিজস্ব মডার্ন আর্ট কোম্পানি রয়েছে। তিনি তার বাবার কাছ থেকে এই শিক্ষা নিয়েছেন। উপার্জনের কথা জানতে চাইলে তিনি বলেন এর থেকে ‘যা ইনকাম হয় তাই দিয়ে খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকি’। তবে শেষ বয়স কষ্টকর। তিনি বলেন তেমন আর কাঠের খোদাই এর ভালো কারিগর পাওয়া যাচ্ছে না। বর্তমানে ছাঁচ শিল্পের অবস্থার কথা জানতে গেলে বলেন- পরিশ্রম বেশি, ছুটি নেই, তেমন উপার্জন নেই যার ফলে নতুন প্রজন্মের কেউ এই পথে আসতে চাইছে না। তিনি শেষ জেনারেশন। এই কাজটি একটা সময় হারিয়ে যাবে।

ধীমান দাস: এই ছাঁচ খোদাই কারুকার্যের সঙ্গে ৩৫ বছর ধরে যুক্ত আছেন। তিনি বলেন ৩ পুরুষ ধরে (প্রায় ১০০ বছর) তার দাদুর আমল থেকে এই কাজ করে চলেছেন, চিৎপুর নতুন বাজারে। তিনি তার বাবার কাছ থেকে এই কাজটি শেখেন। প্রথমে মডার্ন হাই কোম্পানিতে কাজ করতেন, পরবর্তীকালে দাস কোম্পানি নামে দোকান খোলেন। এই মডিফিকেশন এর যুগে বিভিন্ন ধরনের ছাঁচ ঢুকলেও তার কোনো অসুবিধা নেই। তার কাছে প্রায় ১০০০ রকমের ছাঁচ আছে এ কথা তিনি বলেন। তিনি এটাও বলেন অ্যালুমিনিয়াম এর ছাঁচ থেকে এক ধরনের রস নিঃসৃত হয় বলে বেশীর ভাগ মিষ্টির দোকানদারেরা অধুনিক ছাঁচ না নিয়ে কাঠের ছাঁচ কিনে নিয়ে যান। এছাড়া কাঠের ছাঁচ নষ্ট হয় না। কে.সি. দাস, ননী গোপাল এর মত বিখ্যাত মিষ্টির দোকানদারেরা তার কাছ থেকে ছাঁচ কেনেন। অনেকে তাঁর কাছ থেকে ছাঁচ দেশ-বিদেশেও কিনে নিয়ে যান। সাধারণ মানুষদের কাছে ছাঁচের চাহিদা যথেষ্ট রয়েছে। বিশেষ করে বিবাহ অনুষ্ঠান বা পুজো পার্বণে ছাঁচের চাহিদা, বাকি সময়ে থেকে অনেক বেশি। তিনি বলেন পরিশ্রম ও নকশার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন রকমের (৫০, ১০০ , ১৫০, ২০০, ৪০০ টাকার) দামের ছাঁচ রাখা

হয়। বেশিরভাগ ছাঁচই সেগুন কাঠের বানান। তিনিও দুঃখের সঙ্গে বলেন যে, পরিশ্রম থাকায় এ কাজে তিনি শেষ জেনারেশন। এর পর কেউ এই কাজে আর আসবে না। তাঁকে ২০২৫ সালে কলকাতা আন্তর্জাতিক বই মেলায়, 'এনগ্রেভড্ ইলাস্ট্রেশন' নামক স্টলে একটা জায়গা দেওয়া হয়েছিল। সেখানে তিনি ছাঁচ গুলি কাঠে খোদাই করে প্রদর্শন করেন। (ছবি: ১১) এই প্রদর্শনীতে ছাঁচের খোদাই কাজ দেখতে সাধারন দর্শনাথীদের ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ করা যায়। এর থেকে প্রমান পাওয়া যায় যে, এই শিল্প এখনও মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম।

ছবি: **১১**, ধীমান দাস, ছাঁচ খোদাই করছেন, কলকাতা আন্তর্জাতিক বই মেলায়, এনগ্রেভড্ ইলাস্ট্রেশন নামক স্টল, (চিত্র সংগ্রহ: লেখক)

জয়ন্তকুমার দাস: জয়ন্ত কুমার দাস প্রথমে বাবার কাছ থেকে কাজ শিখলেও পরবর্তীকালে পুরো হাতের কাজ তার দাদার কাছ থেকে শেখেন। তার বাবা কাঠের ব্লকের কাজ করতেন। অফ সেট, ডিটিপি ছাপাই মেশিন চলে আসার ফলে, তার দাদা এই ডাইস নিয়ে ভাবতে শুরু করেন এবং পরবর্তীকালে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি বলেন আগের থেকে এখন নকশার কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। আগে যেরকম মাছ ,প্রজাপতি, শঙ্খ ইত্যাদি ছিল সেগুলো আজও আছে, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডিজাইনের পরিবর্তন হয়েছে। তবে জিনিসের দাম বাড়ার ফলে ছাঁচের আকারের পরিবর্তন ঘটেছে। তিনি বলেন ছাঁচ বানাতে গেলে কাঠকে ছোট ছোট টুকরো করে তাকে রেদা দিয়ে মসৃণ করে, তার উপরে পেন্সিল দিয়ে নকশা করে, তার চার ধারে বাটালি দিয়ে কাটা হয়। বিভিন্ন টুলস দিয়ে বিভিন্ন রকমের লতাপাতা, ফুল, ফল, পশু-পাখি ইত্যাদি নকশা করা হয় এবং বার্মা সেগুন কাঠ দিয়ে খুব ভালো ডিজাইন হয়। তবে দামের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার ফলে মেহেগনি কাঠ ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে চিন্তাধারার মধ্যে অনেক কিছু নিয়ে আসা হয়েছে, যেমন বিধানসভা ও পার্লামেন্টের জন্য বিভিন্ন রকমের ছাঁচ তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া তাঁর তৈরি ছাঁচ দেশ-বিদেশে রপ্তানিও হয়। তিনি বলেন- তাতে তিনি খুব তৃপ্তি লাভ করেন। এছাড়া বাচ্চাদের আকর্ষণের জন্য কার্টুনের (ডোরেমন, মটু পাতলু ইত্যাদি) বিভিন্ন ধরনের ছাঁচ তৈরি করেছেন। যত দিন যাচ্ছে, দাম বাড়ার ফলে, ছাঁচ ছোট হতে চলেছে। তাতে নকশা করতে অনেক অসুবিধা হচ্ছে। ফলে গুণগত মান খারাপ হচ্ছে। এছাড়া মিষ্টির জন্য আলাদা আলাদা ছাঁচ হয়। যেমন- ছানার মিষ্টির জন্য বেশি নিখুঁত নকশার ছাঁচ ব্যবহার হয় এবং নারকেল ছিবড়ে বলে কম নকশা ও একটু বেশি গর্ত করা ছাঁচ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তার কাছ থেকে যানা যায় ছাঁচকে যত্ন করে রাখতে গেলে, প্রথম দিন তেলে ভিজিয়ে রেখে পরের দিন সকালে তুলে মুছে রাখলে ছাঁচের স্থায়ীত্ব অনেক বেড়ে যায়। তিনি বলেন যে, ছাঁচের বর্তমানে চাহিদা আছে কিন্তু খোদাই কারিগরি কম থাকায় উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে না।

উপসংহার:

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এইটুকু বোঝা যাছে যে, তিনটি উপকরণ, যথা- মাটি, পাথর, কাঠের ছাঁচ ব্যাবহার করা হয়। এই ঐতিহ্যবাহী ছাঁচগুলি শুধুমাত্র মিষ্টির নান্দনিক রূপসজ্জার মাধ্যম নয়, বরং বাংলার শিল্প-সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ ধারক। তবে দুর্ভাগ্যবশত, এই সমস্ত ছাঁচ গুলি হারিয়ে যেতে চলেছে। যদিও বর্তমানে মিষ্টির দোকানের স বেশি থাকায় ছাঁচের চাহিদা রয়েছে তবে উৎপাদনের পরিমান কম। যার ফলস্বরুপ দেখা যাচ্ছে চিৎপুরের নতুন বাজার অঞ্চলে, রাস্তার দুই ধারে পাঁচ থেকে ছটি মাত্র খোদাই কারিগরের দোকান টিকে আছে।

দক্ষ খোদাই কারিগরি শিল্পীদের সংখ্যা আশঙ্কা জনক ভাবে কমে যাওয়ায় একজন শিল্পীর পক্ষে দিনে পাঁচ থেকে সাতটির বেশি ছাঁচ তৈরি করা সম্ভব হয় না। আশানুরুপ উপার্জন না থাকায় এই খোদাই কাজে নতুন প্রজন্মের কেউ যোগ দিতে চাইছে না। এর একটি উদাহরণ হিসাবে, পাথরের তৈরি আমসত্বের ছাঁচ এর কথা উল্লেখ করা যায়, যা একসময়ে খুবই জনপ্রিয় ছিল। কাঠের দামের পরিমান বেড়ে যাবার ফলে কম দামের কাঠ ব্যবহার করতে হচ্ছে, যা ছাঁচের স্থায়ীত্ব এর উপর প্রভাব ফেলছে।

এছাড়া আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে প্লাষ্টিক, অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকন ইত্যাদি ছাঁচের প্রতি সাধারণ মানুষের ঝোঁক বাড়ছে। কারণ এগুলি সস্তা, সহজলভ্য ও দ্রুত উৎপাদনযোগ্য, সেই সঙ্গে অনলাইনে খুব সহজে বাড়িতে বসে ছাঁচগুলি পাওয়া যায়। যার ফলে ঐতিহ্যবাহী ছাঁচগুলি খুব দ্রুতই লুপ্ত হতে চলেছে। তাই এই ছাঁচ কারুশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, বেসরকারি সংগঠন বা এনজিও এর পক্ষ থেকে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মেলা, হস্তশিল্প প্রদর্শনী, ওয়ার্কশপের মাধ্যমে এই শিল্পকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন রকমের প্রচেষ্টা চলছে।

তবে কেবল প্রদর্শনীই যথেষ্ট নয়; এই শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে হলে সরকারি পৃষ্টপোষকতা, কারিগরদের জন্য প্রশিক্ষণ, আর্থিক অনুদান ও বাজার সম্প্রসারণের মতো দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা জরুরি। একমাত্র তখনই এই ঐতিহ্যবাহী ছাঁচ খোদাই শিল্প তার যথার্থ মর্যাদা ফিরে পাবে এবং নতুন প্রজন্মের শিল্পীরা এই পেশায় আগ্রহী হবে।

তথ্যসুত্র:

১. ঝা, উৎপল ও দাস মুখোপাধ্যায়, স্বাগতা। *আদি জনতা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার*। প্রতিক্ষণ, প্রথম সংস্করণ- ২০২৩, কলকাতা-১২, পৃ: ৫৭।
২. তদেব, পৃ: ৭৫।
৩. তদেব, পৃ: ২৮।
৪. তদেব, পৃ: ২৬।
৫. তদেব, পৃ: ৮০।
৬. পাল, অসিত। বটতলার ডায়েরি। মায়া বুকস মায়া আর্ট স্পেস, প্রথম প্রকাস-২০২৪, কলকাতা-০৭, পৃ: ৫৮।
৭. তদেব, পৃ: ৩৪।
৮. চক্রবর্তী, বরুণকুমার। লোকজ শিল্প। পারুল, প্রথম সংস্করণ-২০১১, কলকাতা-১১, পৃ: ৩২৫।
৯. পাল, অসিত। বটতলার ডায়েরি। মায়া বুকস মায়া আর্ট স্পেস, প্রথম প্রকাস-২০২৪, কলকাতা-০৭, পৃ: ৪২।
১০. চক্রবর্তী, বরুণকুমার। লোকজ শিল্প। পারুল, প্রথম সংস্করণ-২০১১,কলকাতা-১১, পৃ: ৩২৬।
১১. তদেব, পৃ: ৩২৭।
১২. সাঁতরা, তারাপদ। পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীসমাজ। সচিব লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, সরকার এন্টারপ্রাইজ, কলকাতা-৭৪, ২০০০, পৃ: ৩২৫।
১৩. সাঁতরা, তারাপদ। পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীসমাজ। সচিব লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, সরকার এন্টারপ্রাইজ, কলকাতা-৭৪, ২০০০, পৃ: ৩৩।
১৪. তদেব, পৃ: ৩৪।
১৫. তদেব, পৃ: ৩২৫।
১৬. হোর, সালিল। "সন্দেশের ছাঁচ ও সমান্তরাল সামাজিক দর্পণের গল্প (Diece of Sweets and the reflection of society on it)", 'বঙ্গদর্শন', সন্দেশের ছাঁচ ও সমান্তরাল সামাজিক দর্পণের গল্প (Diece of Sweets and the reflection of society on it) – কোলকাতার নকশি-কথা (Kolkatar Nokshi Kotha) (wordpress.com)। প্রকাশের তারিখ: ২২শে জানুয়ারী, ২০২৫।
১৭. হোর, সালিল। "সন্দেশের ছাঁচ ও সমান্তরাল সামাজিক দর্পণের গল্প (Diece of Sweets and the reflection of society on it)", বঙ্গদর্শন',সন্দেশের ছাঁচ ও সমান্তরাল সামাজিক দর্পণের গল্প (Diece

of Sweets and the reflection of society on it) – কোলকাতার নকশি-কথা (Kolkatar Nokshi Kotha) (wordpress.com)। প্রকাশের তারিখ: ২২শে জানুয়ারী, ২০২৫।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. ঝা, উৎপল ও দাস মুখোপাধ্যায়, স্বাগতা। *আদি জনতা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার*। প্রতিক্ষণ, প্রথম সংস্করণ- ২০২৩, কলকাতা-১২।

২. পাল, অসিত। বটতলার ডায়েরি, মায়া বুকস মায়া আর্ট স্পেস, প্রথম প্রকাশ-২০২৪, কলকাতা-০৭।

৩. চক্রবর্তী, বরুণকুমার। লোকজ শিল্প, পারুল, প্রথম সংস্করণ-২০১১, কলকাতা-১১।

৪. সাঁতরা, তারাপদ। পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীসমাজ। সচিব লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, সরকার এন্টারপ্রাইজ, কলকাতা-৭৪, ২০০০।

৫. হোর, সালিল। "সন্দেশের ছাঁচ ও সমান্তরাল সামাজিক দর্পণের গল্প (Diece of Sweets and the reflection of society on it)", বঙ্গদর্শন', সন্দেশের ছাঁচ ও সমান্তরাল সামাজিক দর্পণের গল্প (Diece of Sweets and the reflection of society on it) – কোলকাতার নকশি-কথা (Kolkatar Nokshi Kotha) (wordpress.com)। প্রকাশের তারিখ: ২২শে জানুয়ারী, ২০২৫।

৬. পাডুই, দীপঙ্কর। "বাংলার মায়েদের প্রযুক্তি: সন্দেশ, আমসত্ত্ব কিংবা পিঠেপুলির ছাঁচ", বঙ্গদর্শন, https://www.bongodorshon.com/home/story_detail/technique-of-benglai-mother-s-mold-of-sandesh , প্রকাশের তারিখ: ২২শে জানুয়ারী, ২০২৫।

৭. Banerjee, Anirban. Mould. Sahapedia, https://www.sahapedia.org/moulds, Acesssed on 24th January, 2025.

৮. দত্ত, কল্যানী। অতীতের মধুরতার স্মৃতি: বাঙলার ছাঁচ। Volume 1, Issue 2022. অতীতের মধুরতার স্মৃতি: বাঙলার ছাঁচVolume 1 | Issue 11 [March 2022] - On Eating। প্রকাশের তারিখ: ২৫শে জানুয়ারী, ২০২৫।

৯. Banerjee, Anirban. Mould- Making: A Dying Art of Bengal. Sahapedia, Mould-making: A Dying Art of Bengal | Sahapedia , প্রকাশের তারিখ: ১০শে মার্চ , ২০২৫।

১০. Roy, Sourav. Moulds for Sweet. Sahapedia, Moulds for sweets | Sahapedia

১১. মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিপ্রদাস। মিষ্টান্ন-পাক। ফিক্টোরিয়া প্রেস, দ্বিতীয় সংস্করণ-১৩১১, কলকাতা। https://archive.org/details/bub_man_30479d5f6786fca4e448331635fcf943/page/n1/mode/1up প্রকাশের তারিখ: ১৬শে মার্চ, ২০২৫।

১২. ঘোষ, শাশি। এই কাঠের ছাঁচেই সুদর্শন হয় সন্দেশ, একা হাতেই বানিয়ে চলেছেন বাহাত্তরের রুদ্রদেব। THE Indian Express ie বাংলা, https://bengali.indianexpress.com/west-bengal/mistir-chanch-rudradeb-das-kolkata-notun-bazar-697593/ প্রকাশের তারিখ: ১৯সে মার্চ, ২০২৫।

১৩. Bhattacharya, S. Chandrima. Shapes that hold up taste of sandesh in Kolkata. My Kolkata, https://www.telegraphindia.com/my-kolkata , Acessed on 19th March, 2025.

১৪. Chatterjee, Debamita. "Terracotta Sandesh Mould /পোড়ামাটির সন্দেশের ছাঁচ", https://debamitachatterjee.wordpress.com/tag/sandesh/, Acessed on 19th March, 2025.

১৫. Bhattacharya, Rajan. "History and Origin of Sandesh: A Sweet Delicacy from West Bengal",https://www.slurrp.com/article/history-and-origin-of-sandesh-a-sweet-delicacy-from-west-bengal-1727161328839, Acessed on 19th March, 2025